পথের টানে

মহারাজা নন্দকুমার পূজিত গুহ্যকালী

শাশ্বতী রায় চৌধুরী

তারা মাকে দর্শন করতে তারাপীঠ গিয়েছি বেশ কয়েকবার। কিন্তু ওখান থেকে মাত্র ৩০.৬ কিমি দূরে আকালীপুর (ভদ্রপুরের পাশের গ্রাম) গ্রামে গুহ্যকালীর মন্দির দর্শনের আশা পূরণ হয় না একবারও। নানা কারণে বাধা পড়ে বারবার।

২০২৪-এর মার্চ মাসে আমরা ভাইবোনেরা ঠিক করি মহারাজা নন্দকুমার প্রতিষ্ঠিত মা গুহ্যকালীকে দর্শন করব। এই সংকল্পে প্রধান উৎসাহী আমার তরুণী কন্যা।

তারাপীঠে মার্চের প্রথম সপ্তাহে সুন্দর বসন্তের পরিবেশ। দুদিনের জন্য তারাপীঠ মন্দিরের সামান্য দূরত্বে হোটেল নিলাম আমরা। প্রথম দিন ঘণ্টা তিনেক লাইনে দাঁড়িয়ে তারা মাকে দর্শন ও পূজা নিবেদন হল। মন বলে, মা তারাও তো কালীর একটি রূপ। এখানে ভিড় পেলাম বটে, কাল আকালীপুরে মা গুহ্যকালীকে পাব একান্ত নিরালায়। এই মন্দিরের মাহাত্ম্য থাকলেও প্রচার নেই তেমন।

সুলেখিকা

দ্বিতীয় দিন ভোরের আকাশে রক্তিম আভা ছড়াতেই আমরা অরুণদেবকে প্রণতি জানিয়ে গাড়ি ছোটাই আকালীপুরের উদ্দেশে। শান্ত সকাল। চারদিক ঘুমের জড়তা মাখা। পানাগড় মোড়গ্রাম হাইওয়েতে গাড়ি এলে অবাক হওয়ার পালা। যতদূর চোখ যায় লরি দাঁড়িয়ে আছে সারিবদ্ধভাবে। একটুও নড়াচড়া নেই। আমাদের গাড়িও দাঁড়িয়ে গেল ওই ।৪৩।

লাইনে। জানলায় চোখ রেখে দেখি পাশেই বহুদূর বিস্তৃত একটি সবুজ ঘাসে ছাওয়া মাঠ। চারটে শিমূল গাছ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে লাল ফুলের ডালি মাথায় সাজিয়ে। প্রকৃতি মায়ের আদুরে কন্যে। ডালে ডালে বুলবুলি পাখি শিস দিয়ে গাইছে প্রভাত সংগীত। টুপটাপ করে শিমুল ফুলের ঝরা দেখতে দেখতে মন উদাস হয়। পিছিয়ে যায় আড়াইশো বছর। হয়তো এই পথ দিয়েই ঘোড়া ছুটিয়ে কতবার গেছেন রাজা নন্দকুমার তাঁর ভদ্রপুরের বাড়িতে।

১৭০৫ সালে বীরভূম জেলার ভদ্রপুর গ্রামে জন্ম হয় বিচক্ষণ, বহুমুখী গুণের অধিকারী প্রবল দূরদর্শী নন্দকুমারের। সিরাজ-উদ-দৌল্লার দাদু আলিবর্দি খাঁ প্রথম তাঁকে হিজলি ও মহিষাদলের আমিন নিযুক্ত করেন। পরে নিজ বুদ্ধিবলে নন্দকুমার প্রথমে দেওয়ান ও পরে ওই প্রদেশের ফৌজদার হন। সিরাজের বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খল জীবন তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তাই সিরাজকে সরানোর এক গোপন ষড়যন্ত্রে তিনি ইংরেজদের সাহায্যকারীর ভূমিকায় থাকেন। এই পরিস্থিতির চরম রূপ হল পলাশির যুদ্ধ ও সিরাজের পতন। ১৭৫৮ সালের ১৯ আগস্ট তিনি নদীয়া, বর্ধমানের তহশিলদার হন। ওই সময় মুর্শিদাবাদের রেসিডেন্ট হন ওয়ারেন হেস্টিংস। এই সময় থেকে নন্দকুমার ও হেস্টিংসের মধ্যে নানা কারণে বিবাদ শুরু হয়। ইংরেজরাও বাংলার সিংহাসনে একবার মীরজাফর, একবার মীরকাশিম আবার মীরজাফর এই হাত বদল করানোর খেলায় লেগে থাকায় বিচক্ষণ নন্দকুমার অনুভব করেন ব্রিটিশের প্রকৃত উদ্দেশ্য। তিনি উপলব্ধি করেন, মুসলমান শাসন শেষ। ইংরেজরা শাসনব্যবস্থার দখল নিতে চলেছে। তাই ব্রিটিশদের দেশ থেকে তাড়ানোর জন্য তিনি ব্রিটিশ বিরোধী শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে শুরু করেন।

চিন্তায় ছেদ পড়ে বোনের ডাকে। ঘড়ি দেখি। দুঘণ্টা হল আমরা একই জায়গায় গাড়িতে বসে আছি। আজ আকালীপুর থেকে তারাপীঠ ফিরে বিকেলে হাওড়া ফেরার ট্রেনের টিকিট। তাই সকালেই এমন দেরি হলে কখন পুজো দেব? কখন ফিরব? দারুণ চিন্তায় মন আবার আড়াইশো বছর এগিয়ে একেবারে বাস্তবে।

পুজোর সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে নিবেদন না করতে পারলে মনে যে নিদারুণ দুঃখ হবে! ধৈর্যশীল ড্রাইভার ছেলেটি এবার পিছন দিকে কিছু পথ গাড়ি ফিরিয়ে একটি মেঠো পথ ধরে এগোয়। মনপ্রাণ দিয়ে মাকে জানাই, এবার যেন দর্শন পাই। যা হোক, পঁয়তাল্লিশ মিনিট চেষ্টা করে গাড়ি অবশেষে আকালীপুর এল।

গাছপালা ঘেরা নির্জন এলাকা। ঘিঞ্জি বসতি এলাকায় হঠাৎ একটা দেবমন্দির—এমন নয়। দুটো মাত্র পূজাসামগ্রীর দোকান। খোলা মাঠ।

আসার আগে অনেকবার, অনেকদিন ধরে ফোনে গুহ্যকালীর মূর্তি দেখেছি। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে উঠে দরজায় চোখ রাখতেই মনে হল কত চেনা এই হাসি। একান্ত আপন কেউ যেন বসে আছেন আসনে।

একখণ্ড নিটোল কষ্টিপাথর থেকে তৈরি প্রায় পাঁচফুট মাপের অপূর্ব দেবীমূর্তি। যতদূর জানা যায় দেশে এমন একটি তাৎপর্যপূর্ণ কালীমূর্তি আর নেই। আয়তাকার কালো পাথরের বেদি। যার উপর দুটি কালো কুণ্ডলিত সাপের ওপর অর্ধপদ্মাসনে বসে আছেন দেবী গুহ্যকালী। বেদির চারকোণায় চারটে সাপের ফণা। অজানা কোনও সাধক শিল্পী তাঁর গভীর তন্ত্রসাধনার জ্ঞান থেকে তৈরি করেছিলেন এমন এক আশ্চর্য মূর্তি। মা ত্রিনয়না, বিস্ফারিত চোখ। রজোগুণের প্রতীক

মায়ের জিহ্বাকে বেষ্টন করে আছে সত্ত্বগুণের প্রতীক শ্বেতশুভ্র দাঁতের সারি। মাথায় সাপের মুকুট যা সহস্রার চক্রের প্রতীক। দেবীর গলায় পঞ্চাশটি নরমুণ্ড দিয়ে তৈরি মালা। কান থেকে বুক অবধি নেমে এসেছে মৃত শিশুশবের অলংকার। গলায় সাপের উপবীত। নাভিকুণ্ডের উপর দিয়ে সাপের কোমর বেষ্টনী। দুহাতে সাপের কঙ্কন। সর্প এখানে কুলকুণ্ডলিনী শক্তির প্রতীক। তন্ত্রমতে দেবীর এই মূর্তি সংহারলীলার পরে। তাই এই আপাত ভয়ংকর রূপের মাঝেও প্রশান্তির ভাব। তাই দেবীর দুই বাহু, যা শুধু সৃষ্টিকর্মের প্রতীক। এক হাতে বর, অপর হাতে অভয়।

গুহ্যকালীর রূপ গৃহস্থের কাছে অপ্রকাশ্য। কিন্তু তিনি সাধকের আরাধ্যা। তাই বামাখ্যাপা প্রায়ই আসতেন এখানে। তিনি আদর করে মাকে 'বেদের বেটি' বলে উল্লেখ করেছেন। মহাকাল সংহিতা মতে কালীর নয়টি রূপের মধ্যে গুহ্যকালী প্রধান।

এতদিন ধরে যে-মন্দিরে আসার এত আকুতি ছিল তা সফল হওয়ায় প্রশান্তিতে ভরে ওঠে মন। মন্দিরে সকালে এসে পুজোর জোগাড় করে রেখে পুরোহিতমশাই বাড়ি গেছেন। বারোটার আগে নাকি তিনি পূজা করেন না। অপেক্ষা ছাড়া উপায় নেই।

ঘুরে দেখি মন্দির চত্বর। ট্রাস্টি বোর্ড নেই বলে রক্ষণাবেক্ষণ, নিয়মকানুন সবই শিথিল। নন্দকুমারের বংশধরেরা সম্ভবত দায়িত্ব নিয়ে কিছুই করেন না, মন্দিরের অবস্থা দেখলে বোঝা যায়।

মন্দির থেকে নেমে সামান্য দূরত্বে গেলেই গ্রিল দিয়ে ঘেরা মায়ের আদি বেদি, যেখানে মন্দির হওয়ার আগে দেবীমূর্তির পূজা হত। ওখান থেকে আর একটু গেলে ব্রাহ্মণী নদীর খাত। এই নদীপথে নন্দকুমার মূর্তি নিয়ে আকালীপুর আসেন। অপর পাড়ে গভীর বন, এই পাড়ে শ্মশান। নির্জন চারদিক। ব্রাহ্মণীর তীরে তীরে কিছু জলচর পাখি খেলে বেড়াচ্ছে। দূরের জঙ্গল থেকে ভেসে আসা একটানা একটা পাখির শিস নির্জনতা বাড়িয়ে চলেছে। আমরা ছাড়া মাত্র পাঁচ-ছয় জন পূজার্থী এসেছে মায়ের কাছে। মন্দিরের সিঁড়িতে এসে বসি পূজারিজীর অপেক্ষায়।

মায়ের দিকে তাকিয়ে ভাবি কতকালের প্রাচীন যে অপরূপ মূর্তি, তা কোথাও স্পষ্ট করে বলা নেই। কথিত, এই মূর্তির পূজা করতেন জরাসন্ধ। এর পরের তথ্য অনেক বেশি ইতিহাসনির্ভর।

ইন্দোরের রানি অহল্যাবাঈ হোলকার (১৭২৫-১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দ) একবার স্বপ্নাদেশ পেয়ে কাশীর গঙ্গায় শিবের অনুসন্ধানে লোক লাগান। ওইসময় নদী থেকে এই অনুপম মূর্তি উঠে আসে। রানি মা প্রথম দর্শনেই আপ্লুত হন। পরে তিনি মূর্তি প্রতিষ্ঠা নিয়ে কুলগুরুর মত চাইলে গুরুদেব জানান, "এই মূর্তির পূজা গৃহস্থের সাধ্যাতীত। গৃহীর পরিবারের জন্য মঙ্গলদায়ী নয়।" রানিমা চিন্তিত হন, দেবীমূর্তি নিয়ে কী করবেন ভেবে।

কাশীর রাজবংশের সঙ্গে অহল্যাবাঈয়ের সুসম্পর্ক ছিল। তিনি একদিন কথাপ্রসঙ্গে কাশীরাজ বলবন্ত সিংকে জানান ওই মূর্তির কথা। কেবল গোপন করেন তাঁর মূর্তিপ্রতিষ্ঠার অপারগতার কারণ। বলবন্ত সিংকে একদিন তিনি আসতে বলেন তাঁর গৃহে গুহ্যকালী দর্শনে। রাজা বলবন্ত সিং মূর্তি দেখে প্রবল আনন্দের সঙ্গে নিজের রামনগর প্রাসাদে মাতৃবিগ্রহ নিয়ে আসেন। সেখানে সাড়ম্বরে চলতে থাকে গুহ্যকালীর আরাধনা।

হঠাৎ অল্পদিন পরেই ১৭৭০ সালের ২২ আগস্ট রাজা মারা যান। এবার রাজা হন তাঁর পুত্র চৈত সিং। বলবন্ত সিংয়ের কোম্পানির কাছে চব্বিশ লক্ষ টাকা ঋণ ছিল। চৈত সিং-এর কাছ থেকে ।৪৫।

ঘুষ নিয়ে হেস্টিংস চৈত সিং-কে কোম্পানির ঋণ থেকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করে দেন। নৈতিকতাহীন কূটকৌশলী হেস্টিংস শুধু বুঝতেন টাকা নিজ হস্তগত করার কৌশল।

রামনগর প্রাসাদে একদিন হেস্টিংস চৈত সিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। দেবগৃহে এত বড় দেবীমূর্তি! নিটোল মহামূল্যবান কষ্টিপাথরে তৈরি। দেখে হেস্টিংসের রাতের ঘুম চলে যায়। তাঁর তখন শুধু চিন্তা, কীভাবে ওই মূর্তি লন্ডনে পাচার করবেন। হাতে পাবেন অনেক টাকা।

কর্মসূত্রে, পারিবারিক প্রয়োজনে নন্দকুমার মাঝে মাঝে কাশী যেতেন। তাঁর সঙ্গে চৈত সিংয়ের ঘনিষ্ঠতা ছিল। বলবন্ত সিংয়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে নন্দকুমার চৈত সিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে রামনগর প্রাসাদে যান। সন্ধ্যায় ঠাকুরঘরে ঘণ্টাবাদ্যির আওয়াজে নন্দকুমার দেবতাকে প্রণাম জানাতে এসে চমকে ওঠেন। প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোকে দর্শন হয় দেবী গুহ্যকালীর। এই মূর্তি তো বেশ কয়েকবার তিনি স্বপ্নে দর্শন করেছেন! আপ্লুত নন্দকুমার চৈত সিংকে তাঁর স্বপ্নদৃষ্ট এই মূর্তির কথা বলেন।

সারারাত চৈত সিং জেগে থাকেন শয্যায়। তাঁর মনে তখন অনেক চিন্তার ভিড়। দেবীর অর্চনা শুরু হওয়ার পরেই পিতার দেহাবসান। তাছাড়া লোভী হেস্টিংসের চোখের ভাষা ভুল বোঝার মতো মানুষ নন তিনি। ওয়ারেন হেস্টিংস থাবা বাগিয়ে আছে। চৈত সিং নিজে দুর্বল। আর্থিকভাবে বন্দি হয়ে পড়েছেন ইংরেজের কৌশলের কাছে। তবে কি দেবীমূর্তি গৃহীর পক্ষে পূজনীয় নয় !

বছর ছয়েক হল নন্দকুমার দিল্লির বাদশাহর কাছ থেকে 'মহারাজা' উপাধি পেয়েছেন। তিনি যথেষ্ট শক্তিশালী। হেস্টিংসকে সত্যি করে কেউ যদি পরোয়া না করেন তবে তিনি হলেন নন্দকুমার। চৈত সিং এও জানেন, নন্দকুমার শাক্ত ও তন্ত্রমতে পূজা-অর্চনায় বিশেষ আগ্রহী।

ভোরের আলো ফুটতেই চৈত সিং ছুটে যান মা গুহ্যকালীর কাছে। চোখের জলে মাকে জানান সবদিকে তাঁর অক্ষমতার কথা।

প্রাসাদমন্দিরে ভোরের মঙ্গলারতি দর্শনে নন্দকুমার এসে দাঁড়ান। তাঁর মনে হয়, মা যেন তাঁকে কিছু বলবেন। আরতির শেষে সেই কথা জানান চৈত সিং। "আপনার যদি কোনও আপত্তি না থাকে, এই বিগ্রহ আপনি ভদ্রপুর নিয়ে যান।" বিস্মিত নন্দকুমার তখন বাক্যহারা। দুহাত কপালে ঠেকিয়ে ভাবেন, এই তাহলে মাতৃ আজ্ঞা?

সেদিন অমাবস্যা। রাতের নিকষ কালো অন্ধকারে চৈত সিং নিজ উদ্যোগে বিশেষ বজরায় যাত্রা করিয়ে দেন মা গুহ্যকালীকে। আনন্দিত মনে নন্দকুমার চলেছেন ভদ্রপুরের উদ্দেশে। কেবল রামনগরের গঙ্গাতীরের ঘাটে চৈত সিং দাঁড়িয়ে থাকেন ঝাপসা অসহায় দৃষ্টি নিয়ে।

তিনদিন দুরাত কেটে যায় কোথা দিয়ে। প্রবল উৎসাহী মাঝিমাল্লারা। ততোধিক উৎসাহী নন্দকুমার। নৌকা এবার গঙ্গার শাখা ব্রাহ্মণীর স্রোতে এসে পড়ে। নন্দকুমার আদেশ দেন সোজা ভদ্রপুরের ঘাটে যেতে।

পরে পড়ন্ত এক বিকেলে মাঝিরা দেখে নৌকার গতি ঘুরে যাচ্ছে ভদ্রপুরের কয়েক কিলোমিটার আগে আকালীপুরের দিকে। সেখানে বনজঙ্গল, হিংস্র জানোয়ারের বিচরণক্ষেত্র। নদীর তীরে মহাশ্মশান। নন্দকুমার ভাবেন, মা তাহলে এবার গৃহীর বাসগৃহে নয়, প্রতিষ্ঠা চাইছেন শ্মশানে !

ব্রাহ্মণী নদীর কূলে নির্জন শ্মশানে অস্থায়ী একটি আসনে গুহ্যকালীর পূজা শুরু করান

নন্দকুমার। কয়েক মিটার দূরত্বে জঙ্গল কেটে মন্দির তৈরির ব্যবস্থাপনা চলতে থাকে জোরকদমে।

এবার নন্দকুমার নিজে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন নানা জটিল সমস্যা নিয়ে। হেস্টিংসের সঙ্গে বাড়ছে বিবাদ। তাই নিয়ে কাউন্সিলে নালিশ জানানো। তার জন্য পরামর্শ। এসব নিয়ে তিনি তখন মাসের অনেকটা সময় কাটান তাঁর কলকাতার (বিডন স্ট্রিটের কাছের) বাড়িতে। মন্দির তৈরির দায়িত্ব দেন পুত্র গুরুদাসের ওপর।

মুর্শিদাবাদের কুঞ্জঘাটা রাজবাড়িতে নন্দকুমারের এক মেয়ের বিয়ে হয়। ওই বাড়ির দপ্তরে নন্দকুমারের লেখা (১১৭৮ বঙ্গাব্দ, ২৯ পৌষ) একটি চিঠি পাওয়া যায়। চিঠির একটি অংশে তিনি লেখেন, "সবিশেষ পত্রার্থে জ্ঞাত হইবে ১১ই মাঘ রটন্তী চতুর্দশী শ্রীশ্রী দুই প্রতিমার স্থাপন করাইবে।" যে-দুটি প্রতিমার কথা বলা হয়েছে তার একটি গুহ্যকালী, অপরটি গৌরীশঙ্কর।

রটন্তী কালীপূজার দিন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হলেন গুহ্যকালী। নির্জন শ্মশানে, জনহীন প্রান্তরে। অতি সাদামাটা দুর্গ আকারের অষ্টকোণাকৃতি একচালা মন্দির। ছোট ছোট বাংলা ইটে তৈরি। গায়ে কারুকার্য নেই। মন্দিরে যথাযথ প্লাস্টারও করা সম্ভব হয় না।

মন্দিরটি খুব ব্যস্ততায় তৈরি করা হল। গর্ভগৃহটি স্বল্প পরিসরের। গর্ভগৃহ ঘিরে পরিখার মতো আটকোণা বিশিষ্ট মন্দির এটি। তিনটি দরজা। প্রধান দরজা দক্ষিণ দিকে। দেবী দক্ষিণমুখী। মন্দির লাগোয়া আর কোনও গঠনশৈলী তৈরি করার সময় ছিল না গুরুদাসের হাতে। এর কারণ অর্থাভাব নয়। পিতা ও তাঁর পরিবার তখন নিদারুণ দুশ্চিন্তায়। কোম্পানির সঙ্গে বিবাদে বৃদ্ধ পিতা ক্রমশ যেন একা হয়ে পড়ছেন।

কোথা দিয়ে দ্রুত কেটে যেতে থাকে দিনগুলি। ওয়ারেন হেস্টিংস পদমর্যাদা বাড়িয়ে ১৭৭৩ সালে গভর্নর হন। কিন্তু ওই সালেই রাজ্য সংক্রান্ত নিয়ামক বিধি (Regulating Act) পাশ হয় ইংল্যান্ডে। ওই আইনবলে গভর্নরের একক ক্ষমতা কমিয়ে আরও চারজন সমপদমর্যাদার ব্যক্তিকে নিয়ে একটি কাউন্সিল গঠন করে দেওয়া হয়। এই কাউন্সিল প্রথম থেকেই হেস্টিংসের নানা দুর্নীতির কথা জেনেছিল। এবার নন্দকুমার সেই সুযোগ নিয়ে কাউন্সিলের কাছে হেস্টিংসের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ জানাতে থাকেন বারবার।

1871

হেস্টিংসও সুযোগ খুঁজতে থাকেন নন্দকুমার নামক পথের কাঁটাকে চিরতরে সরিয়ে দিতে। হঠাৎ সুযোগ আসে হেস্টিংসের হাতে। তিনি নন্দকুমারের নামে এক মিথ্যে জালিয়াতির অভিযোগ আনেন। নন্দকুমার নাকি বুলাকিদাস নামের এক আগরওয়ালা ব্যবসায়ীর দলিল জাল করে কোম্পানির কাছ থেকে আটচল্লিশ হাজার একুশ টাকা আত্মসাৎ করেছেন।

সাল ১৭৭৪। কলকাতার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হয়ে এলেন ইলাইজা ইম্পে, যিনি লন্ডনে হেস্টিংসের সহপাঠী ছিলেন। এই ষড়যন্ত্রে তিনি বন্ধুকে পুরো সঙ্গ দিলেন।

৬ মে ১৭৭৫ রাত দশটায় নন্দকুমার বন্দি হন। পরদিন সন্ধ্যায় ভদ্রপুরের জমিদারিতে খবর আসে, নন্দকুমার জেলবন্দি হয়েছেন জালিয়াতির দায়ে। তড়িঘড়ি কলকাতা ছুটে যান পুত্র গুরুদাস। ৯ জুন থেকে কোর্টে শুরু হয়ে যায় বিচারের নামে প্রহসন। মাত্র সাতদিনের বিচারপর্ব। নন্দকুমার পুত্রকে বুঝিয়ে বলেন পরিস্থিতি। পরিণতি তাঁর জানাই। ১৬ জুন ঘোষিত হয় প্রাণদণ্ডাদেশ।

ভারতের ইতিহাসে এই ফাঁসি প্রথম Judicial murder. সত্তর বছরের এক বৃদ্ধকে শুধু জালিয়াতির অভিযোগে ৫ আগস্ট কলকাতার খিদিরপুর অঞ্চলে (কুলিবাজার) প্রকাশ্য রাস্তায় কয়েক হাজার মানুষের সামনে ফাঁসি দেয় হেস্টিংসের অনুগত লোকেরা।

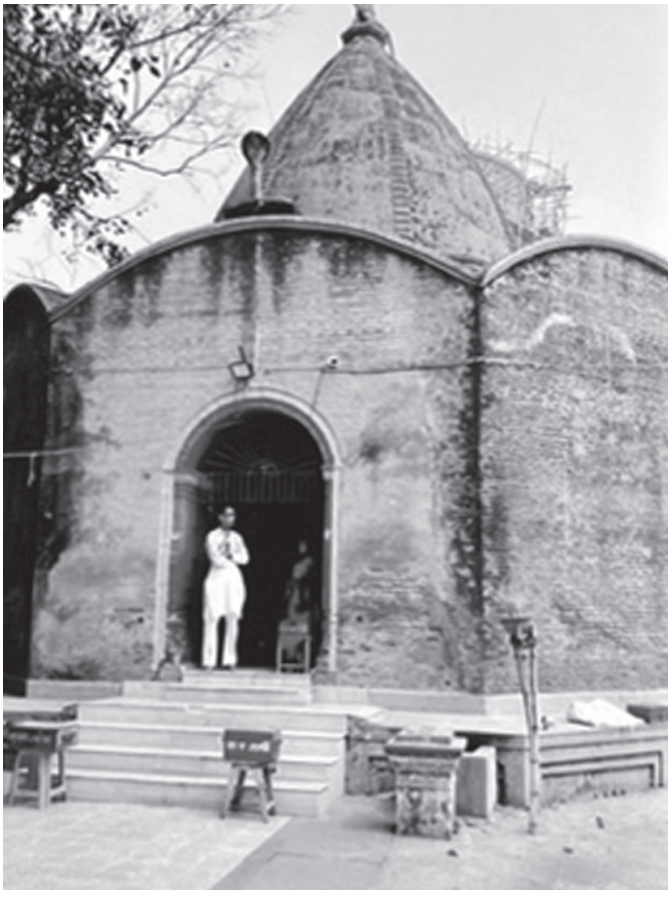

১৪৮১

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ভদ্রপুরের আকাশে ঘনিয়ে ওঠে কালো মেঘ। গুরুদাস তখন প্রাসাদশীর্ষে দাঁড়িয়ে। আন্দাজ করেন, চরম ক্ষণটি বোধ হয় ঘনিয়ে এল। হঠাৎ প্রবল বিদ্যুতের ঝিলিক। সঙ্গে মেঘের গর্জন। তিনি দেখলেন বাজ পড়ল গুহ্যকালীর মন্দিরের মাথায়। চিড় ধরে গেল দেবালয় শীর্ষে।

ঢং ঢং করে মন্দিরের ঘণ্টা হঠাৎ বেজে ওঠে। আমার সম্বিত ফেরে। সিঁড়ি থেকে উঠে তাকিয়ে দেখি আমার পাশ দিয়ে কখন পূজারি ও অন্যান্য সবাই উঠে গেছেন টের পাইনি। এবার সত্যিই তাড়া। মাকে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম। কেবল ভক্তি ছাড়া আমার আর কিছু দেওয়ার ছিল না। প্রার্থনা করি কেবল শান্তির।